ভাষার লড়াইয়ে নারীঃ কেন্দ্র থেকে প্রান্ত

শান্তা পত্রনবীশ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookShanta

ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই এ আন্দোলনের সাথে নারীসমাজের সম্পৃক্ততা ছিল। ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং বিবৃতিতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করার প্রেক্ষাপটে এদেশের বহু নারী প্রতিবাদমুখর হয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন (হেলাল, ১৯৮৪)। যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজের ছাত্রী ও ছাত্র ফেডারেশন কর্মী হামিদা রহমান কলকাতা থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা* পত্রিকায় ১০ জুলাই 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি পত্রে বাংলা ভাষার বিরোধিতাকারীদের প্রচেষ্টার প্রতিবাদ জানান (হান্নান, ১৯৮৬)। এর কিছুদিন পরই ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় তমদ্দুন মজলিশ। পরবর্তীসময়ে ২রা সেপ্টেম্বর সিলেটে বাংলা ভাষার সমর্থকরা প্রথমে যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে, সেখানেও নারীর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। এই পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন জোবেদা খাতুন, হাজেরা মাহমুদ প্রমুখ (পারভিন, ২০০৭)। সেই সময় সারাদেশেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বহু আলোচনা, সভা-সমিতি, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল এবং নারীরাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৫ই অক্টোবর *আজাদ* পত্রিকার মহিলা মাহফিলে আয়েশা বেগমের 'ভাষা সমস্যা' শিরোনামে আলোচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীসময়ে ১৩ই নভেম্বর তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা প্রচলন করার সমর্থনে আয়োজিত সভায়ও নারীর অংশগ্রহণ ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন পত্রিকাতে বিবৃতি, আলাপ-আলোচনা ও সভা-সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৪৮ সালে এতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে সিলেটের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১১ই জানুয়ারি পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুর রব নিশতার সিলেট সফরে যান। সেখানকার নারীদের একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে দেখা করে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। একই বছর ২২শে ফেব্রুয়ারি সিলেট মহিলা মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী বেগম জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহের বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন, সিলেট রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুন, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, সামসী কাইসার রশীদ, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, মাহমুদা খাতুন, শামসুন্নেসা খাতুন ও অন্যান্য বিশিষ্টজন (নারী) পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের কাছে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে বাংলা ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান (পারভিন, ২০০৭)। এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জোবেদা খাতুনের বিরুদ্ধে সিলেটের দৈনিক *ইস্টার্ন হেরাল্ড* পত্রিকা বিরূপ মন্তব্য করে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন বলেন:

> যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কু-পুত্র তুল্য। অনেকে আবার না বুঝিয়া ধর্মের দোহাই শুনিয়া উর্দুর সমর্থন করেন।...আমাদের বক্তব্য ছিল যে, উর্দু ভাষাভাষী অধিকসংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া পর্দানশীল

> মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্ভব। ফলে অল্পশিক্ষিতা নারী জাতি অশিক্ষিতা হইয়া যাইবেন এবং স্বামী-পুত্রের সহযোগিতা করিতে পারিবেন না (বেগম, ১৯৮৯, পৃ. ১৩১)।

তাদের স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম মহিলা লীগের সভানেত্রী জোবেদা খাতুনের কাছে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখেছিলেন, 'আজ সত্যি আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ এবং অশেষ গৌরব অনুভব করছি, সিলেটের পুরুষরা যা পারেনি আপনারা (মহিলারা) তা করেছেন' (মোহাম্মদ, ১৯৯৪, পৃ. ২৬)।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব-বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনার সময় গণপরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং অনেকেই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্য খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন এই বিরোধিতার শীর্ষে। নাজিমউদ্দীনের সক্রিয় সমর্থনে এই বিলটিকে পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বিলটি বাতিল করা হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহী, ২৮শে ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর, পাবনা এবং মুন্সিগঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট করেন এবং বিরাট মিছিল বের করেন। একই দিনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলনে যে প্রতিনিধি দল যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হাজেরা মাহমুদ ও লায়লা আর্জুমান্দ বানু কলকাতায় এক বিবৃতি দিয়ে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করে খাজা নাজিমউদ্দীনের গণপরিষদের উক্তির প্রতিবাদ করেন (হেলাল, ১৯৮৪)।

ইতোমধ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারি তমদ্দুন মজলিশ ও পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভায় ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলা হয়, গণপরিষদের সরকারি ভাষা-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকেটে বাংলা ব্যবহার না করা ও নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করার দাবিতে এই ধর্মঘট করা হবে। এই সাধারণ ধর্মঘট পালনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন নারীরা। ১৯৪৭-৪৮ সময়ে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সে আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশ বিভাগের আগে সাধারণ নারীরা ঢাকায় বিশেষভাবে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন হচ্ছে এ জাতীয় প্রথম আন্দোলন যেখানে নারীসমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নারীসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই বাংলার নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এই পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঢাকার বাইরে জেলা ও মহকুমা শহর অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে তা ছড়িয়ে পড়ে। তাই বর্তমান প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনে এলাকাভিত্তিক (কেন্দ্র থেকে প্রান্ত) নারীর ভূমিকা আলোচিত হবে।

গবেষণা-কৌশল

বর্তমান প্রবন্ধটি প্রধানত তথ্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে নারীর ভূমিকার ঐতিহাসিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ দুইই এ গবেষণায় স্থান পেয়েছে। এই গবেষণা-কাজে প্রাথমিক (সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা ও আত্মকথা, পত্রিকার প্রতিবেদন) ও দ্বৈতীয়িক (প্রবন্ধ, গ্রন্থ) উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে।

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরিতে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য বক্তার সাথে ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুনও বক্তৃতা করেন। মাহবুবা খাতুন বক্তৃতায় বলেন, ''বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে'' (*আজাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। এ সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে *সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* গঠিত হয়। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আনোয়ারা খাতুন, লিলি খান প্রমুখ। *রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষা প্রচলন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র-ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করে (হেলাল, ১৯৮৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শোভাযাত্রা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ইডেন কলেজের ছাত্রী শরীফা খাতুনসহ কয়েকজন ছাত্রী হোস্টেল থেকে পালিয়ে মিছিল করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে গিয়ে ছাত্রজনতার সমাবেশে যোগদান করেন (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭)। এই সভা শেষে ছাত্রজনতার এক বিরাট মিছিল সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। সে সময় ছাত্রীদেরও একটা মিছিল বের হয়। শহরের তিন শতাধিক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় হতে মূল শোভাযাত্রার সঙ্গে বের হয়ে সেক্রেটারিয়েট ভবনের নিকট হতে তাদের নিজস্ব একটি শোভাযাত্রা-সহকারে বিক্ষোভ করতে করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয় (ইসলাম, ১৯৮৪)।

ভাষা আন্দোলনের তৎপরতাকে বিস্তৃত করতে ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ সময় পাঁচশত পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় নাদেরা বেগম এবং শাফিয়া খাতুনকে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী ও অন্য ছাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেন (হক, ২০০০)। নূরুন্নাহার কবীরের হাতের লেখা সুন্দর ছিল বলে তিনি বেশিরভাগ পোস্টার লেখার দায়িত্বে ছিলেন। তাকে সাহায্য করতেন রওশন আরা বাচ্চু, মাহফিল আরা, রাবেয়া ইসলাম, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, কায়সার লিলিসহ আরও অনেকে (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭)। এরই মধ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'র সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য প্রস্তুতিও চলছিল। প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল। বিশেষ করে লায়লা সামাদ, শাফিয়া খাতুন, শামসুন নাহার, সারা তৈফুর, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা রহমান, হালিমা খাতুন প্রমুখ ছাত্রীগণ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; যেমন মুসলিম গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রীদের আন্দোলনের পক্ষে

উদ্‌বুদ্ধ করেন (আহমেদ, ২০১৬)। সেই সময় আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মতিন অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রোকেয়াকে। রোকেয়া অন্য কয়েকজন ছাত্রীসহ প্রায় দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন (মতিন ও রফিক, ১৯৯১)।

২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে। কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. শামসুল হক কোরেশী সমগ্র ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে *সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ*'-এর উদ্যোগে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি না সে বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বেগম আনোয়ারা খাতুন (উমর, ১৯৯৫)। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। এই সভায় ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রীরা যোগদান করে। মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের মধ্য থেকে পঁচিশ-ত্রিশ জন ছাত্রী সমাবেশে যোগদান করেন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সারা তৈফুর (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭)। সেই সময় মুসলিম গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা স্কুল, ইডেন কলেজ, আনন্দময়ী গার্লস হাইস্কুলসহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রীদের সংগঠিত করে সমাবেশে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন শাফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, সুফিয়া খান, আমিনা মাহমুদ, শামসুন নাহার, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া করিম (কামাল, ১৯৮৭)।

২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতা চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী জাহানারা লাইজু। জাহানারা লাইজু সাইকেল চালাতে পারতেন বলে তাকে এবং গাজীউল হকের ছোটো ভাই নিজামকে চিঠি বহন করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেওয়া হয় (হেলাল, ১৯৮৪)। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দশজন করে ছাত্র-ছাত্রীর দল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে যোগদান করবে বলে স্থির হয়। গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে মিছিলের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সশস্ত্র পুলিশ ছেলেদের গ্রুপ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে আটক করে ট্রাকে তুলে নেওয়ায় ছেলেরা আর সামনে যেতে পারেনি। এর পরপরই সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার, সারা তৈফুর প্রমুখ বেশ কয়েকজন ছাত্রী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হন। ধারণা ছিল তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে পুলিশ মেয়েদের এগিয়ে যেতে বাধা দিবে না বা লাঠিচার্জ করবে না। রওশন আরা ও অন্যরা গেট থেকে বের হওয়ার সময় স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়েই অবস্থান করছিলেন কিন্তু তাদের এগিয়ে যেতে দেখে অন্য ছাত্রীরাও বের হতে শুরু করেন। এভাবে কিছুটা মিছিলের আকার ধারণ করলে দেওয়াল টপকে এসে কিছু ছাত্রও মিছিলের পেছনে যোগদান করেছিলেন। তারা মেডিক্যালের বর্তমান প্রবেশদ্বারের কাছে আসতেই পুলিশের লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের ফলে রওশন আরা বাচ্চুর গায়ে লাঠির আঘাত লাগে। রওশন আরা বাচ্চু আকস্মিক আঘাতে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। রাস্তার পাশে রেস্টুরেন্টের কাছে কয়েকটি ভাঙা রিকশা ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এরপর ছুটে যান সাইন্স এনেক্সের কম্পাউন্ডে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ওসমান গণির বাসভবনের দিকে। সেখানে বাসভবনের বারান্দায় সুফিয়া ইব্রাহিম,

শামসুন নাহার ও সারা তৈফুরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সহায়তায় তারা হোস্টেলে ফিরে আসেন (পারভিন, ২০০৭, পৃ. ৩১-৩২)।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-ঘোষিত কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের পাশাপাশি ইডেন কলেজের ছাত্রীরাও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা পোস্টার বিতরণ, স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের উদ্‌বুদ্ধ করা এবং পিকেটিংয়ের কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ইডেন কলেজের যেসকল ছাত্রী ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন শরীফা খাতুন, সুফিয়া করিম, রওশন জাহান হেনা, মাহবুবা খাতুন, উম্মে সাঈদা সিদ্দিকী, মনোয়ারা ইসলাম, গুলে ফেরদৌস, চেমন আরা, মনু, হেনা, রহিমা, দুলু, লুৎফুন্নেসা বেগম, আমিরুন্নেসা, শাহাদৎ আরা, রাজিয়া চৌধুরী, ফিরোজী বেগম, রাহাত আরা প্রমুখ। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হোস্টেলের ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রচারপত্র দিয়ে গেলে ইডেন হোস্টেলের ছাত্রীরা তা বিলি করতেন। তারা পোস্টার বিলি, স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের উদ্‌বুদ্ধ করার কাজও করতেন। প্রথম দিকে হোস্টেল প্রশাসন আন্দোলনকারীদের প্রতি কঠোর ছিলেন। হোস্টেলের গেটে তালা দেওয়া সত্ত্বেও ছাত্রীরা দেওয়াল টপকে অথবা দারোয়ানের সহযোগিতায় বের হয়ে মিটিং-মিছিলে যোগ দিতেন (খাতুন, ২০১৮)। ১৯৫২ সালে হোস্টেল সুপার ছিলেন আরবির অধ্যাপক হালিমা খাতুন। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আফিয়া খাতুন মাঝে মাঝে হোস্টেল সুপারের বাসায় থাকতেন। আফিয়া খাতুন ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের স্ত্রী। এই পরিবেশে ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রমে হোস্টেল প্রশাসন কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে ইডেন কলেজের অনেক ছাত্রীই অংশ নেন। ভাষা আন্দোলনে ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে শরীফা খাতুন বলেন:

> ... ২১ তারিখ সকালে ৯টার দিকে আমরা নাস্তা করে আমতলায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। সকালে ইডেনের গেট বন্ধ ছিল। আমরা কেউ দেয়াল, কেউ গাছ বেয়ে দেয়াল পার হলাম। সেদিন হোস্টেল থেকে আমরা ৩০ জনের মত ছাত্রী গিয়েছিলাম। সঙ্গে ব্যানার ছিল। ১৪৪ ধারা তো আমরা কয়েকজন কয়েকজন করে গিয়েছি। সবাই একসঙ্গে যাই নি। রাস্তায় পুলিশ দেখতে পেলাম। হাফপ্যান্ট পরা, হাতে লাঠি। আমতলায় গিয়ে দেখি অনেক লোকজন। মুসলিম স্কুল থেকেও মেয়েরা এসেছে। কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীরাও ছিল। শ'খানেক মেয়ে ছিল মনে হয়। আমরা আমতলার একপাশে বসলাম। ... ভাষা আন্দোলনে নারী শুধু সক্রিয়ভাবে অংশই নেননি বরং নিজের গায়ের গয়না এবং টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছেন। এমনকি ইডেন কলেজের আমরা একদিন রান্না করে জেলখানায় পাঠিয়েছি (*ভোরের কাগজ*, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)।

ইডেন কলেজের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রী মনোয়ারা ইসলাম ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। হোস্টেলের মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আন্দোলনে অর্থের জোগান দিতেন তিনি। সেই সময় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পুলিশ তল্লাশি করবে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে সেই হলের এক ছাত্রের দেওয়া একটি প্যাকেট আমগাছের গোড়ায় গর্তের ভেতর পাতা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। প্যাকেটে ছিল হ্যান্ড মাইক, যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে জানানো হতো। এভাবেই সব বিপদ উপেক্ষা করে ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি (সাদিয়া, ২০১৬)।

এছাড়া তৎকালীন কন্ট্রোলরুম হিসেবে খ্যাত সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ইডেন কলেজের ছাত্রীবৃন্দ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে ইডেন কলেজের হোস্টেলের তৎকালীন

ছাত্রী ভাষাসংগ্রামী গুলে ফেরদৌস বলেন, ''আমরা হোস্টেলের মেয়েরা কোঁচড় ভরে খাবার নিয়ে জানালা গড়িয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের তুলে ধরা সার্টের ভিতর খাবার ঢেলে দিয়েছি। কারণ সলিমুল্লাহ হল পুরোটা পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে আবাসিক ছাত্ররা রাতের অন্ধকারে আমাদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে যেত'' (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭, পৃ. ৪৪)। ইডেন কলেজের ছাত্রীগণ মেডিক্যাল হোস্টেলে আহতদের কাছেও খাবার পৌঁছে দিতেন। এই দলে অন্যতম ছিলেন রওশন জাহান হোসেন। এক পর্যায়ে হোস্টেল সুপারের আদেশে হোস্টেলের গেটে তালা ঝোলানো হয়, যাতে ছাত্রীরা ভেতরে না যেতে পারে। তখন তারা ইট জোগাড় করে গেট টপকিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। এভাবেই সব বাধা, রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে ছাত্রীগণ ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্রী মালেকা খান, রওশন আহমদ দোলন, কাজী খালেদা খাতুন, জুলেখা হক, হাবিবা খাতুন ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম গার্লস স্কুল ও বাংলা বাজার স্কুলের ছাত্রীরাও ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের আহত হওয়ার ঘটনা পরবর্তী দিন অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারি আনোয়ারা খাতুন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন:

> ... এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই – ছেলেদের কথা আর নাই বল্লাম, যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানেনা সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয় – দু'একটি কথায় কিছুটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব – মিলিটারী মেয়েদের গাড়ীতে করে নিয়ে কুর্মিটোলায় ছেড়ে দিয়েছে। যে Ministry-র আমলে এই সমস্ত অত্যাচার হয়– যারা মাতৃজাতির সম্মান দেয় না, তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পুলিশের লাঠি চার্জে মেয়েরা Wounded হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে দু'জনার নাম দিচ্ছি। একজন হলো ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে মিস সুফিয়া ইব্রাহিম। আর একজন হলো মিস রওশন আরা থার্ড ইয়ার বি.এ। মেয়েদের Total wounded এর সংখ্যা হল ৮ জন। মন্ত্রীসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে (*Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly*, ১৯৫২, p. ৯৮)।

একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে আন্দোলন পরিচালনা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিলেন ছাত্রীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার, রওশন আরা, আমেনা মাহমুদ, কায়সার সিদ্দিকী, খোরশেদী আলমসহ আরও অনেক ছাত্রী এই চাঁদা তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি সুফিয়া খাতুন ও মোসলেমা খাতুন শান্তিনগর আর মালিবাগ এলাকায় চাঁদা তুলতে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা যে যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, সব বাড়িতেই তারা ছাত্রদের জন্য সহানুভূতি পেয়েছেন। গৃহিণীরা তাদের সাধ্যমত চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেছেন। অনেক বাড়িতে নারীরা গুলিবিদ্ধ ছেলেদের কথা বলে আপনজন হারানোর মতো কেঁদেছেন (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭)। ২৩শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকাটুলি, আজিমপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় চাঁদা তোলা হয়। সারা তৈফুর, সুফিয়া ইব্রাহিম, হালিমা খাতুন, শামসুন্নাহারসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা চাঁদা তোলায় নেতৃত্ব দেন। ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা সুফিয়া করিম মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে চাঁদা তোলার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন (পারভিন, ২০০৭)। উত্তোলিত চাঁদা সলিমুল্লাহ হলে ভাষা আন্দোলনের কন্ট্রোলরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এছাড়া

২৩শে ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের সামনে নির্মিত শহিদ মিনারে অনেক নারী পুষ্পস্তবক অর্পণের পাশাপাশি হাতের কানের অলংকার খুলে দিয়েছিলেন ভাষা আন্দোলন চালানোর জন্য। শিক্ষাবিদ, লেখক আনিসুজ্জামানের মা সৈয়দা খাতুন শহিদ মিনারের পাদপ্রান্তে সোনার হার নিবেদন করেছিলেন (আনিসুজ্জামান, ২০১৫)। এভাবেই ছাত্রী থেকে শুরু করে গৃহিণীরা পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং সমর্থন করেন।

নারায়ণগঞ্জ

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই নারায়ণগঞ্জে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ ছিল প্রতিবাদ, মিছিল, বিক্ষোভ ও সমাবেশের শহর। এ দিনও সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং বিকেলে রহমত উল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউট মাঠে এক বিশাল জনসভা হয়। সভা চলাকালীন নারায়ণগঞ্জবাসী জানতে পারেন, ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি করা হয়েছে এবং কয়েকজন ছাত্র শহিদ হয়েছেন। এই খবর শোনামাত্রই জনসভা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন মর্গ্যান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম একটি মিছিল সহকারে সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে তাতে তিনি এবং তার নেতৃত্বে মর্গ্যান স্কুলের ছাত্রীসহ নারায়ণগঞ্জের নারীরাও যোগদান করেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ভাষাসংগ্রামী আবুল গফুর চৌধুরী বলেন, ''ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নারায়ণগঞ্জে এটাই ছিল মহিলাদের প্রথম মিছিল। এতে আন্দোলন গতি লাভ করে এবং অন্যান্য কর্মীরা উৎসাহিত হয়'' (মাহবুব, ২০১১, পৃ. ২৭-২৮)। ২২শে ফেব্রুয়ারি ছিল ভাষা-আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসে আরেকটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন সকাল থেকেই নারায়ণগঞ্জ মিছিলের শহরে পরিণত হয়। শ্রমিকনেতা ফয়েজ আহম্মদের সভাপতিত্বে চাষাড়া মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহর ছাড়াও আশেপাশের অঞ্চল থেকে হাজার হাজার শ্রমিক জনসভায় যোগ দেয়। এ জনসভায় মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে নারীদের একটি দল শোভাযাত্রা সহকারে অংশগ্রহণ করে (*আজাদ*, ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৫২)। মমতাজ বেগম এই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সমকালীন রাজনীতিবিদ ও শ্রমিকদের সাথে গোপন বৈঠক করেন, যেন এ আন্দোলন শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তিনি শ্রমিকদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এ আন্দোলন সফল না হলে শুধু ভাষা নয়, বাঙালির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। মমতাজ বেগমের এ দূরদর্শী ও দক্ষ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ফলেই আদমজী জুট মিলের শ্রমিকরা দলে দলে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়েই মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জ ভাষা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন।

২৩-২৮শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন ক্রমাগত জোরালো হতে থাকে। প্রতিদিনই শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল, মিটিং ও প্রতিবাদ সভা চলতে থাকে। জনগণ ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এসব বিক্ষোভে নারীরাও যোগদান করে। এই বিক্ষোভ অব্যাহত থাকার মধ্যেই ২৯শে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মমতাজ বেগমের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি গণবিক্ষোভের আকার ধারণ করে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন মমতাজ বেগমের সাংগঠনিক শক্তি ও সাহসে ভীত হয়েই ২৯শে ফেব্রুয়ারি সকালে তাকে গ্রেফতার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদে মর্গ্যান স্কুলের ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে রাস্তা অবরোধ করেন। খবর পেয়ে অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা, সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিকরাও ছুটে আসেন। তারা কোর্ট এলাকায় এসে বিনাশর্তে মমতাজ

বেগমের মুক্তি দাবি করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনি দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মহকুমা হাকিম ইমতিয়াজী বাইরে এসে বলেন, ''রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে মমতাজ বেগমের গ্রেফতারের কোনো সম্পর্ক নেই, তাকে স্কুলের তহবিল তসরুফের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে''। কিন্ত জনতা তা বিশ্বাস না করে বলতে থাকে, মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মী বলেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তাই তাকে বিনা শর্তে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তারা আদালত প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাবে না। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ তাকে ভ্যানে তুলে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে বিপুল সংখ্যক জনতা চাষাড়া স্টেশনের কাছে রাস্তায় গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ ভ্যান আটক করলে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এর ফলে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত ঢাকা থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌঁছালে জনতা পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। সন্ধ্যার দিকে জনতা কিছুক্ষণের জন্য ছত্রভঙ্গ হলে পুলিশ সেই সুযোগে মমতাজ বেগমকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে প্রায় ৪৫ জন আহত হয়। পুলিশ ঐদিন আন্দোলনের মূল কর্ণধার, নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করে। একই দিনে গ্রেফতার হয়েছিলেন ছাত্রী ইলা বক্শী ও আয়েশা আক্তার বেলু (*আজাদ*, ১ মার্চ ১৯৫২)। ঐদিন রাতে নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং ৭ই মার্চ পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে। মমতাজ বেগমের গ্রেফতারের সূত্র ধরে মোট ১৪৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মমতাজ বেগমকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ সংক্রান্ত এক খবরে বলা হয়, ''One hundred and fifteen persons including two girl students have been arrested. So far in connection in the disturbances as Narayangonj that brookout after the arrest of Mrs. Mumtaz Begum Headmistress of the Morgan Girls High English School on February 29." (*The Statesman*, ৩ মার্চ ১৯৫২)।

মুসলিম লীগ সরকার মমতাজ বেগমকে কারাগার থেকে মুচলেকার শর্তে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে তিনি তার সরকারি চাকরি হারান। তার স্বামী আবদুল মান্নাফ তখন ঢাকার সিভিল সাপ্লাই অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকার আবদুল মান্নাফকে চাকরি হারাবার ভয় দেখিয়ে চাপ প্রয়োগ করেছিল যেন মমতাজ বেগম বন্ড সইয়ে স্বাক্ষর করেন। আবদুল মান্নাফ জেলখানায় গিয়ে মমতাজ বেগমকে সরকারের শর্ত মেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৫৩ সালের মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহের প্রথম দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মমতাজ বেগম মুক্তি পান। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ পৌর এলাকায় তিনি আরও কিছুদিন অন্তরীণ ছিলেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই তার স্বামীর সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৯ সালে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় (মাহবুব, ২০১১, পৃ. ৩১-৩৮)। নিজের মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে তিনি এতটাই দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে এর জন্য তিনি নিজের চাকরি, স্বামী, সংসার সব কিছু ত্যাগ করতে পিছপা হননি। নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নারীসমাজের অংশগ্রহণ। মিছিল, সভা, সমাবেশে নারীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি শহরের গৃহিণীদের স্বতঃস্ফূর্ত আর্থিক সহায়তাও এই ভাষা আন্দোলন সফল করেছে। নারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মমতাজ বেগম।

টাঙ্গাইল

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলে ধর্মঘট ও প্রতিবাদ-সভা পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং এই উপলক্ষ্যে একটি মিটিংও করা হয়। এক্ষেত্রে কেএন ছাকেরের মেয়ে রুবি, আব্দুল করিম খানের মেয়ে জ্যোৎস্না, ঝর্ণা এবং মহেড়ার সৈয়দ ডাক্তারের মেয়ে ছালেহা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন (হোসেন,

২০১১)। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কুমুদিনী মহিলা কলেজের ছাত্রীরা মিছিল ও সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছালেহা খাতুন নামে এক ছাত্রী দেওয়াল টপকে ছাত্রীদেরকে নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। কলেজের ছাত্রীদেরকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন রাবেয়া সিরাজ। ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি ছাত্রীদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করতে সক্ষম হন। তিনি কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন (সাদিয়া, ২০১৬)। ২২শে ফেব্রুয়ারি কুমুদিনী মহিলা কলেজে ছাত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী কোহিনূর ইউসুফ শাহীর সভাপতিত্বে সভায় কিছু প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় (*আজাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। কুমুদিনী কলেজের ছাত্রী আজিজা বেগম এবং মাহমুদা খানমও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে টাঙ্গাইলের আরও যে সকল ছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন রুবী, সুফিয়া বেগম প্রমুখ (পারভিন, ২০০৭)।

মুন্সিগঞ্জ

১৯৪৮ সাল থেকেই মুন্সিগঞ্জে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা হরতাল পালন করে। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ছাত্রীনেত্রী স্মৃতিকণা গুহ। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানীয় অ্যালবার্ট ভিক্টোরিয়া যতীন্দ্রমোহন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে (রফিক, ২০১৯)।

নরসিংদী

১৯৫২ সালে নরসিংদীর পলাশ থানার দশম শ্রেণির ছাত্রী লীলা চক্রবর্তী পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ঢাকার ভাষা আন্দোলনের খবর পেয়ে স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে সারা এলাকা প্রদক্ষিণ করেছিলেন (পারভিন, ২০০৭)। তাছাড়া বামপন্থি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নরসিংদীর রানু চ্যাটার্জি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ কারাভোগ করেন (মাহবুব, ২০১৫)।

মানিকগঞ্জ

১৯৪৮ সালে মানিকগঞ্জ ছিল ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। তখন থেকেই মানিকগঞ্জে ভাষার প্রশ্নে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫২ সালের আন্দোলনেও মানিকগঞ্জের জনসাধারণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মার্চ মাসের শেষ দিকে স্থানীয় কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন জাহানারা বেগম (রফিক, ২০১৯)। ১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন রোকেয়া সুলতানা। এই কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছিল। এই শহিদ মিনারটি নির্মাণের জন্য উম্মে সাহারা খাতুন তার বাড়ির সামনে (বর্তমান মানিকগঞ্জ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়) জমি দান করেছিলেন (রায়, ২০০০)।

ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে সমাবেশ, মিছিল, হরতাল ও বিক্ষোভ পালিত হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে বিদ্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করে। সামনে কালো পতাকা নিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে তারা। স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলন এবং ছাত্রীদের সংগঠিত করে বিক্ষোভ মিছিল বের করার কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছালেহা বেগম (মোহাম্মদ, ২০১৭)। আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের অপরাধে তিন বছরের জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন হালিমা খাতুন। তিনি ছাত্রীনিবাসের মেয়েদেরকে সংগঠিত করে প্রধান ফটকের তালা ভেঙে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার হাতে ছিল কালো পতাকা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা' স্লোগান দিতে দিতে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তার হাতে কালো পতাকা থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তাই তিনি ছাত্রীনিবাসে ফিরে গেলে বিদ্যাময়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হাসিনা বেগম রাত ১০টার দিকে তাকে হোস্টেল থেকে বের করে দেন। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপেই নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন তিনি (সাদিয়া, ২০১৬)। ময়মনসিংহের আর এক ভাষাকন্যা তাহমীদা সাঈদা। তিনি ১৯৫২ সালে বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তার নেতৃত্বে নারীদের একটি দল কলেজ থেকে বেরিয়ে বিদ্যাময়ী স্কুলের সামনে জড়ো হয়। বিদ্যাময়ী স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রহরা ভেদ করে ছাত্রীরা রাজপথে এগিয়ে আসে। ছাত্রী-মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে পনের দিনের জন্য নজরবন্দি করা হয় তাহমীদা সাঈদাকে (সাদিয়া, ২০১৬)। এভাবেই নারী-পুরুষের যৌথ পদচারণায় ভাষার দাবিতে ময়মনসিংহের রাজপথ প্রকম্পিত হয়েছিল।

নেত্রকোণা

১৯৪৮ সাল থেকেই নেত্রকোণার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে ভাষার প্রশ্নটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালে এই বিষয়ে সাংগঠনিক উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। নেত্রকোণাতে ভাষা আন্দোলনে যারা বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ছায়া রায় (শিক্ষক), কনক চক্রবর্তী (শিক্ষক), মোহিনী সেন (উকিল) প্রমুখ (বিশ্বাস, ২০০০)।

শেরপুর

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন শেরপুরে তেমন জোরালো প্রভাব ফেলেনি। শেরপুরে সত্যিকারভাবে ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে। ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে শেরপুরের যে সমস্ত স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল শেরপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীরা (হাসান, ২০০০)।

জামালপুর

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে *ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ*'র নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে জামালপুর শহরে একটি মিছিল বের হয়। এই মিছিলে জামালপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের যে-সকল ছাত্রী ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম জান্নাত আরা (জামান, ২০০০)।

সিলেট বিভাগ

সিলেট

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে সিলেটেও সভা সমাবেশ চলছিল। ঐ দিন বিকেলে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সিলেটে ঢাকার মিছিলে গুলিবর্ষণের সংবাদ আসলে সিলেটের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই মিছিলে নারীদেরও অংশগ্রহণ ছিল। অনিল কুমার সিংহ সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

> ... সেদিনের মিছিল জিন্দাবাজার হয়ে পয়েন্ট থেকে পূর্বদিকে গিয়ে নয়াসড়ক, ধোপাদিঘীর পাড়, নাইওরপুল, রংমহলের সামনে দিয়ে এসে গোবিন্দচরণ পার্কের দক্ষিণ গেট দিয়ে পার্কের ভিতর জমা হয়েছিল। এই মিছিলের বিশেষত্ব ছিল ছাত্রীরা মিছিলের পুরোভাগে আর ছাত্র জনতা ছিল মিছিলের পেছনের সারিতে। সেই মিছিলের স্লোগান ছিল 'খুনের বদলে খুন চাই', 'নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি। গোবিন্দচরণ পার্কের ভিতরের লাইট পোস্টের নীচে গোল করে মেয়েরা বসে পড়েছে। ছেলেরা দূরত্ব বজায় রেখে মেয়েদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে (কবির, ২০১৮, পৃ. ১৩০)।

২২শে ফেব্রুয়ারি নারী নেতৃবৃন্দ শহরের পাড়ায় পাড়ায় প্রচারণা চালান এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি নারীরা শহরে এক বিরাট মিছিল বের করেন। সিলেট শহরে নারীদের এত বড়ো মিছিল এর আগে হয়নি। মিছিলটি সকাল এগারোটায় শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে গোবিন্দচরণ পার্কে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে পার্কে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরী এবং অন্যান্য নারী ও ছাত্রী নেতৃবৃন্দ। বিকেলে নারীদের আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ এর মূল সভাকক্ষ জিন্নাহ হলে, যা বর্তমানে শহিদ সুলেমান হল হিসেবে পরিচিত (মোহাম্মদ, ২০১৭)। পরবর্তীসময়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারি সিলেটে নারীদের একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এতে অনেক সম্ভ্রান্ত নারীসহ স্কুল কলেজের ছাত্রীরাও যোগদান করেন। তারা ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের তদন্ত এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন (*আজাদ*, ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। পরবর্তী সময়ে ১লা মার্চ পর্যন্ত সিলেটে সাধারণ ধর্মঘট হয়। ৫ই মার্চ হরতাল পালিত হয়। এ সময় আন্দোলন সিলেট শহর ছাড়িয়ে মহকুমা ও থানা শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনগুলোতেও নারীর অংশগ্রহণ ছিল। সিলেটের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ছিলেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া আলী, যোবেদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, ছালেহা খাতুন প্রমুখ। এছাড়া শরিফুনেছা খান চৌধুরী, সামসি খানম চৌধুরী, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, নূরজাহান বেগম, সৈয়দা খাতুন, মাহমুদা খাতুন প্রমুখ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে অবদান রেখেছেন (আহমদ, ২০১১)। এদের মধ্যে ছালেহা খাতুন স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন (মোহাম্মদ, ২০১৭)।

মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ভাষা আন্দোলন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মৌলভীবাজারের বিখ্যাত সৈয়দ বংশের মেয়ে সৈয়দা নাজিবুন্নেছা খাতুন (মোহাম্মদ, ২০১৭)।

সুনামগঞ্জ

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় সুনামগঞ্জকে তেমন প্রভাবিত করতে না পারলেও ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঢেউ এখানেও পৌঁছে যায়। সুনামগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন শাহেরা বানু চৌধুরী। এছাড়া হাজেরা মাহমুদ সুনামগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন (রফিক, ২০১৯)।

হবিগঞ্জ

ভাষা আন্দোলনের সূচনায় হবিগঞ্জ অগ্রসর ভূমিকা না রাখলেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি স্থানীয় ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ভাষা কমিটির উদ্যোগে 'বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা' দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং ব্যবসায়ীরা পূর্ণ হরতাল পালন করে (*আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। এছাড়া ভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগ রেখে হবিগঞ্জের ভাষা আন্দোলন পরিচালনায় যারা ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য শান্তি দত্ত (ইসমাঈল, ২০১৯)।

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলনে চট্টগ্রামের নারীগণ ভাষা-আন্দোলনের জনমত গঠন, পোস্টার তৈরি ও লাগানো, চোঙ্গা দিয়ে প্রচারণা, মিটিং, মিছিল প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছেন। চট্টগ্রামে পোস্টার লেখা ও লাগানোর কাজে জড়িত ছিলেন জওশন আরা রহমান, মিরা সেন, প্রভিতা মুৎসুদ্দি, জাহানারা রহমান, হোসনে আরা মাক্ষী প্রমুখ।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে পূর্ণরূপে হরতাল পালিত হয়। শহরের সমস্ত দোকানপাট, যানবাহন, সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। তখন নারীদের রাস্তায় বের হয়ে মিছিল করা সহজ ব্যাপার না হলেও বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে নারীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশের মতো চট্টগ্রামও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র সংসদের নেতা এজহার, মাসুদুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে হালিমা খাতুনের নেতৃত্বে ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রী এসে যোগ দেয়। মিছিলটি অর্পণাচরণ গার্লস কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে আরও কিছু ছাত্রী মিছিলে অংশ নেয়। ছাত্রীদের একটি ট্রাকে উঠিয়ে দিয়ে অন্যরা পেছনে সাইকেল চেপে বা পায়ে হেঁটে মিছিলটি এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে জনতা শহর প্রদক্ষিণ করে। পরের দিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি অসংখ্য শোকমিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি হরতাল ও জনসভা সফল করার জন্য ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে চোঙ্গা দিয়ে মিছিল সহকারে প্রচার কাজ চলে এবং পোস্টারিং করা হয় ও প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। এসব প্রচার প্রচারণায় মেয়েরাও অংশগ্রহণ করেন এবং আন্দোলন সফলভাবে পরিচালনার জন্য চাঁদাও তুলেছেন (চৌধুরী, ২০০০)।

২৫শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শহরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ছাত্রীদের স্বতন্ত্র মিছিল। সেদিন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রতিভা মুৎসুদ্দি, তালেয়া রহমান প্রমুখ ছাত্রীর একটি ছোট্ট মিছিল নিয়ে ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসেন। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে ঢাকার ছাত্রদের ওপর পুলিশি জুলুমের

কথা এবং ছাত্র হত্যার কথা ছাত্রীদের জানান। সেখানে থেকে জওশন আরা রহমান, হালিমা খাতুনসহ অন্যেরা মিছিলে যোগ দেন। এরপর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও যোগ দেন। মিছিলকারী ছাত্রীরা ট্রাকে করে 'মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। চট্টগ্রামের ইতিহাসে নারীদের এই ধরনের স্বতন্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন এটাই প্রথম (চৌধুরী, ২০০০)। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বিভিন্ন নারী সংগঠন। চট্টগ্রামের সর্বদলীয় কর্মপরিষদের হয়ে সেদিন রাজপথে নামেন শেলী দস্তিদার, প্রণতি দস্তিদার (পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বোন), মীরাসহ সিনিয়র শিক্ষার্থী সুলেখা, মিনতিসহ আরও অনেকে (ভৌমিক, ২০১২)। পরে এক সমাবেশে ছাত্রীরা ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন। গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারিতেও চট্টগ্রাম শহরে হরতাল পালিত হয় এবং হাটহাজারী, নাজিরহাট, পটিয়া ও অন্যান্য স্থানের ছাত্র-ছাত্রীরা বাস ও ট্রেনযোগে শহরে এসে মিছিলে যোগ দেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে সভা-সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ তারিখ হরতাল পালিত হয়। ঐদিন চট্টগ্রামের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা খালি পায়ে এক মিছিল বের করেন এবং 'মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন (চৌধুরী, ২০০০)।

ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নারী সদস্যরাও যার যার অবস্থান থেকে তৎপর ছিলেন। ফরিদা হাসান, রমা দত্ত, আরতি দত্ত, প্রণতি দস্তিদার, জওশন আরা বুলবুল, খালেদা খান, জাহানারা জুবলী, গীতা দত্ত (কল্পনা যোশীর ছোটোবোন), কবিতা, হালিমা, সেলিনা, আখতার বানু, বিজয়লক্ষ্মী, নূরুন নাহার, মালেকা আজিম খান, খুরশীদা আজিম খান, লতিফা আজিম খান, ডা. লায়লা, চেমন আরা বেগম, ফৌজিয়া সামাদ প্রমুখ ডা. খাস্তগীর স্কুল থেকে সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সাল থেকে আরতি দত্ত এবং প্রণতি দস্তিদার আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু আত্মগোপনে থেকেও তারা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন (খান, ২০০১)। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল প্রগতিশীল আন্দোলনেই নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

কুমিল্লা

১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার প্রশ্নে সারা দেশ যখন উত্তপ্ত তখন কুমিল্লাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর কুমিল্লায় পৌঁছালে কুমিল্লা শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। বাড়ি বাড়ি কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সবাই কালো ফিতা ধারণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় টাউন হল লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিরাট মিছিল বের হয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিলে কুমিল্লার ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় ফয়জুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী লায়লা রহমানের স্মৃতিচারণ থেকে ছাত্রীদের ভূমিকার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়:

> .... ফয়জুন্নেসা ছিল কুমিল্লাতে নামকরা স্কুল, ছাত্রী সংখ্যাও বেশি। ছাত্ররা স্কুলের সামনে শ্লোগান দিতে লাগল-বোনেরা আমার, ঢাকাতে আমাদের ভাইয়েরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে, তাদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত। আমরা এর প্রতিবাদ করছি, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই, বাংলা চাই, মায়ের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার বৃথা আশা। ইতিমধ্যে দারোয়ান গেটে তালা দিয়েছে, শ্রেণীকক্ষ থেকে বাইরে আসার সাহস কারো নাই। আমি সেদিন অসুস্থ থাকায় স্কুলে যাইনি। এরপর কি ভেতরে বসে থাকা সম্ভব? দৌড়ে গেটের কাছে এলাম ততক্ষণে যেভাবেই হোক কিছু ছাত্রী বাইরে বের হয়ে এসেছে।

> আমাকে পথ আগলে দাঁড়ালেন মেট্রোন খালাম্মা। গেটে তালা। আমার ভেতরটা তখন দাউদাউ করে জ্বলছে। গেটের পাশেই ছিল একটা কাঠগোলাপের কাছ। আমি তরতর করে ঐ গাছ বেয়ে দেয়ালে উঠলাম। আর চোখের পলকে দেয়ালের ঐ পাড়ে চলে গেলাম। স্কুলের পুকুর পাড়ের দিকে একটু জায়গা বেড়া ভাঙ্গা ছিল, আমি ঐ পথে স্কুলে ঢুকলাম এবং সবার বাধা অগ্রাহ্য করে মাঠের মধ্যে চিৎকার করে সবাইকে বাইরে আসতে বললাম, তারা কি তখন আর আটকা থাকে? সবাই মাঠে নেমে এলো। এবং ঐ ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে যেদিকে পারল বের হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল অনেক ছাত্র-ছাত্রীই রাস্তায় নেমে পড়েছে (সিদ্দিকী, ২০১৫, পৃ. ৮৭)।

পরবর্তী সময়ে মিছিলটি শৈলরাণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে স্লোগানরত ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রনেতৃবৃন্দ মেয়েদের নিরপত্তার জন্য সর্তক ছিলেন। বিকেলে অভিভাবকদের কাছে তাদের মেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কোনো কোনো মেয়েকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লায়লা রহমানের স্মৃতিচারণ থেকে আরও জানা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবরে ফয়জুন্নেছা স্কুলের হোস্টেলের কোনো ছাত্রী ভাত খায়নি। ভাতসহ থালা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। রাতে হোস্টেলের মধ্যেই মিছিল করে স্লোগান দিয়েছিল (সিদ্দিকী, ২০১৫)। এছাড়াও ২৫শে ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মিস সাবিহা খাতুনের সভাপতিত্বে কুমিল্লার স্কুল কলেজের ছাত্রীদের এক সভা হয়। সভায় ঢাকার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় (*আজাদ*, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। কুমিল্লায় একুশে উদ্‌যাপনেও নারীর ভূমিকা ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে একুশে উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেন ফাতেমা খায়ের, ফরিদা মীর্জা এবং ছালেহা খাতুন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তৎপরতা বেশি ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা থেকে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা একটি শোভাযাত্রা বের করেন, সেখানে উল্লেখযোগ্য হারে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় (সাকী, ২০০০)। ভাষা আন্দোলনে স্থানীয় সরোজিনী গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। এই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কবি আবদুল কাদিরের কন্যা সুলতানার নেতৃত্বে স্কুলের অন্য ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন (রফিক, ২০১৯)। সুলতানা মিছিল নিয়ে কলেজ-মাঠ প্রাঙ্গণে আসতে চাইলে কর্তৃপক্ষের বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় তিনি অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে গেট ভেঙে কলেজ-মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া আম্বিয়া খাতুন, হোসনে আরা খান, রওশন আরা হেনা, রহিমা খাতুন, মোহসেনা বেগম, নূরজাহান বেগমসহ অনেক ছাত্রী ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

ফেনী

২১শে ফেব্রুয়ারি ফেনীতে মিছিল, ধর্মঘট ও সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে হয়। কিন্তু ঐ দিন রাতে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হওয়ার খবর আসার পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন 'ছাত্র হত্যার বিচার চাই', 'খুনী নুরুল আমিনের কল্লা চাই' স্লোগানে ফেনী শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন ফেনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন (আহমদ, ২০০০)।

টেকনাফ

পঞ্চাশের দশকের যাতায়াত ব্যবস্থার বিবেচনায় টেকনাফ দুর্গম এলাকা হিসেবে গণ্য হতো। সরাসরি টেকনাফ-কক্সবাজার কোনো সড়ক যোগাযোগ ছিল না, যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল জলপথ ও জলযান। টেকনাফের মতো অনুন্নত, দুর্গম অঞ্চলেও ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করে, যখন সেখানে কোনো হাইস্কুলও ছিল না। এ ঘটনা এতটাই সাড়া ফেলেছিল যে, সংবাদ প্রতিবেদনে সংবাদ-শিরোনাম হয়েছিল, 'টেকনাফে মিছিল করেছিল ছাত্রীরা' (রফিক, ২০১৯)।

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে দিনব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন বিকেলে ভুবন মোহন পার্কে ডা. এস. এম এ গাফ্ফারের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। এই জনসভায় জাহানারা বেগম, 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা– আজ জেগেছে সেই জনতা' গানটি পরিবেশন করেন (হক, ১৯৯৫)। ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনা রাজশাহীতে ছড়িয়ে পড়লে ২২শে ফেব্রুয়ারি আতাউর রহমানের নেতৃত্বে রাজশাহীতে হরতাল, বিক্ষোভ-মিছিল এবং প্রতিবাদ-সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরের দিনের মিছিল এবং প্রতিবাদ-সভায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য হাফিজা বেগম, ফিরোজা বেগম, হাসিনা বেগম, খুকু এরা সকলে মিলে একটি পালকি-গাড়িতে করে মাইকের পরিবর্তে চোঙ্গা নিয়ে প্রচারণায় বের হন (বানু, ২০০৪)। ২২শে ফেব্রুয়ারি বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হলে সেই মিছিলে ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রীদেরকে মিছিলে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন পি. এন. গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী মনোয়ারা বেগম। মনোয়ারা বেগম স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এবং মিছিলে গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রীদেরকে বুঝিয়ে মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য একত্র করার চেষ্টা করেন। তার কথা শুনে ক্লাস বর্জন করে ছাত্রীরা মিছিলে অংশ নেন। মিছিল পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দশম শ্রেণির ছাত্রী হাফিজা বেগম টুকু, জাহানারা বেগম, মহসিনা বেগম ও অন্যরা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্দোলনের পক্ষেই সমর্থন দেন। শিক্ষিকাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা নূরমহল খাতুন, হাজেরা বেগম, মনসুরা বেগম, মিনতি, স্নেহ, গীতা, হালিমা, নিরুপমা প্রমুখ। লম্বা মিছিলটি স্কুল থেকে বেরিয়ে সাগরপাড়া ঘুরে কল্পনা হল হয়ে আলুপট্টির মোড় ঘুরে জুবিলী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভুবনমোহন পার্কে যায়। সেখানে গিয়ে অন্যান্য ছাত্রের সাথে বক্তব্য দিয়েছিলেন মনোয়ারা বেগম, ডা. মহসিনা বেগম প্রমুখ। এ বিষয়ে ভাষাসংগ্রামী আখতার বানুর স্মৃতিচারণ:

> পার্কের খোলা বাঁধানো মঞ্চে ছাত্র ভাইদের সাথে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন মনোয়ারা আপা, মহসিনা আপা। কি তীব্র ঝাঁজালো সেই বক্তৃতার কথা। ঢাকায় গুলিবিদ্ধ শহীদ ভাইদের নিহত হবার খবর, পুলিশী নির্যাতন আর তৎকালীন শাসকদের অন্যায় অত্যাচারের বর্ণনা শুনে বুকের ভেতরটায় যেন কষ্টের ঝর্ণা ধারা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরে বুক ভেজাতে লাগলো। সব কথা বুঝিনা, অত শক্ত শক্ত কথার মানেও জানি না, কিন্তু অবুঝ এক ভাবাবেগ মনটাকে অনবরত দলিত মথিত করতে লাগলো। জাহানারা বেগমের কণ্ঠস্বরও সকলকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একাকার করে তুললো (বানু, ১৯৯৯, পৃ. ১০৬)।

রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক আন্দোলনে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ। মিছিল, সভা ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন জাহান আরা বেগম, বেগম মনোয়ারা রহমান, মোহসিনা

বেগম, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম, রওশন আরা, খুরশীদা বানু, ফিরোজা বেগম, ফুলু, নুরমহল খাতুন, হাজেরা, আবেদা, মিনতি, স্নেহ, গীতা, মনোয়ারা বেগম, হাসনা বেগম, হালিমা, মনসুরা, নিরুপমা, সারা খন্দকার, বীণাপাণি বসাক, আরজু, জুলেখা বেগম, আখতার বানু (ইসলাম, ২০০০)। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে নারীদের সরব এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। রাজশাহীর অন্যতম ভাষাসংগ্রামী আব্দুর রাজ্জাক এ প্রসঙ্গে বলেন, ''নারীরা মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করত এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহেও তারা ভূমিকা রেখেছে। তাদের বড় ভূমিকা ছিল চিঠি আদান প্রদানে। তারা কুরিয়ার হিসেবেও কাজ করেছে। তাদের অংশগ্রহণ ছিল প্রগতির সপক্ষে একটি বড় পদক্ষেপ। পরবর্তী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের সহায়ক শক্তি হিসেবে এটি কাজ করেছে'' (কবির, ২০১৮, পৃ. ১২৫)।

রাজশাহীতে আন্দোলন সংগঠন থেকে শুরু করে পোস্টার তৈরি ও বিতরণ, অর্থ-সংগ্রহ, সংবাদ আদান-প্রদান, মিটিং মিছিলে যোগদান ইত্যাদি কাজে নারীগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নির্মিত রাজশাহীতে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের নামফলকে নারী ভাষাসংগ্রামীদের মধ্যে জাহানারা বেগম বেগু, মহসিনা বেগম, জেরিনা বেগম, কুলসুম বেগম, মনোয়ারা বেগম, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম ডলি এবং রওশন আরা খুকুর নাম পাওয়া যায় (স্মৃতিফলক, ২০০৫)।

নাটোর

নাটোরে ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বেগম শামসুন্নাহার। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নাটোরে 'মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতি' গঠন করা হয়। সমিতির উদ্যোগে নাটোরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রকাশ্য মাঠে জনসভার আয়োজন করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জনমত গড়ে তোলা হয়। ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে নাটোর 'মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতি'র উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি এক বিরাট মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। পরবর্তী সময়ে চৌধুরী সাহেবের মাঠে বেগম শামসুন্নাহারের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করা হয়। এই সংবাদ *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:

> নাটোর, ২৯ ফেব্রুয়ারি। ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে নাটোর মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতির উদ্যোগে অদ্য এক বিরাট মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার সভানেতৃত্বে চৌধুরী সাহেবের মাঠে এক সভা হয়। সভায় বক্তৃতাদির পর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচার এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করা হয়। (*আজাদ*, ১লা মার্চ ১৯৫২)

নাটোরে আগে থেকেই বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য বেগম শামসুন্নাহারের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই তার আহ্বানে নাটোরের নারীরা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তার সাথে অন্য যারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ারা খাতুন, জাহানারা বেগম, সালেহা খাতুন প্রমুখ। এদের সবাই 'নাটোর মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতি'র সদস্য ছিলেন (সাদিয়া, ২০১৬)। এছাড়া নাটোরের ভাষা আন্দোলনে নাটোর গার্লস হাই স্কুলের (বর্তমানে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। ক্লাস বর্জন এবং মিছিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন (রফিক, ২০১৯)।

ঈশ্বরদী

ঢাকার ছাত্র-মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর পাবনায় আসলে ঈশ্বরদীর ছাত্রনেতাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে তারা স্কুলের সকল ছাত্রদের একত্র করে বর্তমান খবিরের চায়ের দোকানের মোড়ে একটি পুরানো বটগাছের নিচে এক সমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশ শেষ করে মিছিল করে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রীদের ক্লাস বর্জনের আহ্বান জানানো হয়। ছাত্রীরাও তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। আন্দোলনে যেসব ছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে সুফিয়া বেগম, জাহানারা প্রধান, নূরজাহান বেগম, হালিমা খাতুন, রাবেয়া খাতুন এর নাম উল্লেখযোগ্য (চাদু, ২০০০)।

বগুড়া

ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই বগুড়া সংশ্লিষ্ট ছিল। ১৯৫২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল ও বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে। বগুড়ায় নারীদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন রহিমা খাতুন ও সালেহা খাতুন (খোকন, ২০০০)। কবি আতাউর রহমানকে আহ্বায়ক করে গঠিত 'বাংলা ভাষা সংগ্রাম কমিটি'র সদস্য ছিলেন তারা। ভাষা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা বিষয়ে গাজীউল হকের স্মৃতিচারণ:

> পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিতের পর মুসলিম পরিবার থেকে এ দু'জন ছাত্রীর দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা সেদিন বগুড়াবাসীকে বিস্মিত না করে পারেনি। রহিমা খাতুন সম্পর্কে একটি কথা না বলে পারছি না। তিনি যখন আমাদের এ কমিটির বৈঠকে উপস্থিত হলেন তখন তার সম্পর্কে সংশয়হীন হওয়ার জন্য আমরা তার অভিভাবক ডাক্তার মুজাফফর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। মুজাফফর সাহেব আমাদের কথা শুনে বললেন, 'বাংলা ভাষা আন্দোলনের জন্য আমার বোন সংগ্রাম কমিটির সদস্য হয়েছে এতে আমি গর্ববোধ করছি' (হক, ১৯৯৯, পৃ. ৮৯-৯০)।

তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ অন্য নারীদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সিরাজগঞ্জ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে পিছিয়ে ছিলেন না সিরাজগঞ্জের নারীরাও। সিরাজগঞ্জ ভাষা আন্দোলন কমিটির তত্ত্বাবধায়নে সালেহা ইসহাক স্কুলের ছাত্রী বিজলী, মেহের নিগার প্রমুখ ছাত্রীর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে প্রথম ছাত্রীদের মিছিল হয় (জিন্নাহ, ২০০০)। ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিরাজগঞ্জে যে প্রতিবাদ মিছিল হতো তাতে প্রতিদিনই সালেহা ইসহাক স্কুলের ছাত্রীরাও অংশ নিতেন (আলীম, ২০১৮)। ভাষা আন্দোলন অব্যাহত রাখতে তহবিল সংগ্রহের কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন সিরাজগঞ্জের নারীরা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক' ব্যাজ ছাপিয়ে বিক্রি করতেন তারা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইরা (ডা. মোস্তফা নূরুল ইসলামের স্ত্রী), হেনা (আমির হোসেন উকিলের মেয়ে), বিজলী (শামসুজ্জোহা মল্লিক উকিলের মেয়ে), মনিকা (খোরশেদ আলমের বোন), মেহের নিগার (আবুল মনসুর নূরে এলাহীর মেয়ে) (খান, ২০১১)। অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহ থেকে শুরু করে মিছিল, ধর্মঘট সকল ক্ষেত্রেই সিরাজগঞ্জের নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

রংপুর বিভাগ

রংপুর

রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকেই রংপুরে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে মিছিল কারমাইকেল কলেজ ছেড়ে শহর অভিমুখে যাত্রা করলে শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং জনসাধারণ এতে যোগদান করেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে রংপুরে ভাষা আন্দোলনের সংগঠক অধ্যাপক গোলাম আযম এবং অধ্যাপক জমিরউদ্দিন আহম্মেদকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের গ্রেফতারের খবরে রংপুরের ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় অন্যদের সাথে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন মিলি চৌধুরী এবং নীলুফার বানু ডলি (ভৌমিক, ২০১১)। সভার পরপরই কলেজ থেকে ছাত্র, শিক্ষক, জনতার একটি বিশাল মিছিল শহর অভিমুখে যাত্রা করে। মিছিলটি যখন জেলা জজ কোর্টের সামনে পৌঁছল, সেই মুর্হূতে জজ সাহেব ইংরেজিতে একটি মামলার রায় ঘোষণা করছিলেন। তখন মিলি চৌধুরী এজলাসে প্রবেশ করেন এবং চিৎকার করে বললেন ইংরেজিতে নয়, বাংলায় রায় ঘোষণা করতে হবে। এক পর্যায়ে তিনি জেলা জজ সাহেবের হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে তা ভেঙে ফেলেন। এ ঘটনায় জেলা জজসহ এজলাসের সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন (ভৌমিক, ২০১১)। ২৭শে ফেব্রুয়ারি পাটগ্রাম হাইস্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ শোভাযাত্রা বের করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'গুলি বর্ষণের তদন্ত চাই', 'আটক ছাত্রদের মুক্তি চাই' স্লোগান দিতে দিতে বন্দরের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে। মিলি চৌধুরী ছাড়া রংপুরের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মাসুদা চৌধুরী এবং মিসেস ডলি (ইসলাম, ১৯৯৬)। এছাড়া নেপথ্যে থেকে যারা সবরকম সাহায্য, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন তাদের মধ্যে বেগম আফতাবুন্নাহারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ইসলাম, ১৯৯৯)। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রংপুরে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন। এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যে সকল নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন সাজেদা রহমান, শামিমা জামান, মিসেস ডলি, মিসেস মিলি চৌধুরী, প্রতিভা সমাদার, চিত্রা দাসগুপ্তা প্রমুখ (ইসলাম, ১৯৯৬)। তাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই জনসাধারণের মাঝে ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনাকে ধারণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

নীলফামারী

১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নীলফামারীতে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। নীলফামারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং নীলফামারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় সব ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট, মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নেয়। এই দিনেই নীলফামারীর ইতিহাসে ছাত্রীরা প্রথমবারের মতো প্রকাশ্য মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করে (নিখিল, ২০১১)। ৭ই ফেব্রুয়ারি নীলফামারীতে হরতাল পালিত হয়। জনসাধারণ এবং ছাত্রছাত্রীরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে মিছিলসহ শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে জাকিউল আলমের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় অন্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন সুফিয়া, রাহেলা এবং ফিরোজা বেগম (ইসলাম, ১৯৯৯)। সম্পূর্ণ ফেব্রুয়ারি মাসেই ধর্মঘট, বিক্ষোভ-মিছিল এবং সমাবেশ অব্যাহত থাকে। সকল কর্মসূচিতেই উল্লেখযোগ্য হারে নারীরা অংশগ্রহণ করেছিল।

গাইবান্ধা

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গাইবান্ধার জনগণ ১৯৪৮ সাল থেকে তেমন সক্রিয় না হলেও সীমিত আকারে ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালে গাইবান্ধায় ভাষা আন্দোলন সক্রিয় রূপ লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সকাল থেকেই শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে। স্থানীয় স্কুল, কলেজ এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট পালন করে। সকাল এগারটায় প্রায় পনেরশত ছাত্র-ছাত্রীর এক শোভাযাত্রা বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে (*আজাদ*, ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। গাইবান্ধায় ভাষা আন্দোলনের সাথে যে-সকল নারী সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দৌলতননেছা খাতুন (তোতা, ২০০০)।

পঞ্চগড়

তৎকালীন জনবিরল পঞ্চগড়েও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল। তবে ছাত্রসমাজ সূচিত এই ভাষা আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট, মিছিল, সভা এবং কখনো পিকেটিং এ সীমাবদ্ধ ছিল। পঞ্চগড়ে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রেজিয়া খাতুন (সাজ্জাদ, ২০১১)।

খুলনা বিভাগ

খুলনা

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রদেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল তখন থেকেই খুলনায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস ও কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে একটি প্রচারপত্র তৈরি করা ও পুরানো খবরের কাগজে আলতা দিয়ে পোস্টার লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীসময়ে যে প্রচারপত্রটি ছাপা এবং বিতরণ করা হয়েছিল তাতে বাংলা ভাষা সমর্থনকারী যেসব সংগঠনের নাম ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি (বিশ্বাস, ২০০০)। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের মধ্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন আনোয়ারা খাতুন, রেবা, লুৎফুননাহার, ফাতেমা চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, সাজেদা হেলেন, কৃষ্ণাদাস, সুফিয়া আলী প্রমুখ (কবির, ২০১৮)।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়েও খুলনায় নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি খুলনা করোনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে স্কুলের দেয়ালে বাংলা ভাষার পক্ষে হাতে লিখে পোস্টার লাগান। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার খবর ২২শে ফেব্রুয়ারি খুলনায় আসলে খুলনায় ভাষা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। খুলনার ছাত্রী সমাজও এই সময় ভাষা আন্দোলনে তৎপর হয়ে ওঠেন। এই সম্পর্কে খুলনার করোনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রী নেত্রী রোকেয়া মাহবুব শিরি বলেন:

> ২২ ফেব্রুয়ারি স্কুলে এসে জানতে পারি যে, সালাম, রফিক, বরকতসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র জনতা ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। এই কথা শোনোর পর স্কুলের ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কোথাও কালো কাপড় পাওয়া যাচ্ছিল না। লাইলী নামে একজন ছাত্রী কালো কাপড় পরে স্কুলে এসেছিল। ছাত্রীরা তখন অন্য শাড়ী এনে তাকে পরতে দেয়। আর তার কালো শাড়ী কেটে ব্যাজ বানিয়ে ছাত্রীরা ধারণ করে (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ. ২১১)।

২৩শে ফেব্রুয়ারিও রাষ্ট্রভাষার দাবিতে খুলনায় হরতাল, প্রতিবাদ-সভা এবং মিছিল হয়। মাজেদা আলী, আনোয়ারা বেগম, রোকেয়া খাতুন (শিরি), লুৎফুন নাহার (হেলেন), রাবেয়া, কৃষ্ণা, ফরিদা মজুমদার, খায়রুল নাহার বেবী প্রমুখ ছাত্রী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে এই মিছিলে প্রায় ৫/৬শ ছাত্রী অংশ নেন। এটা ছিল শহরে মেয়েদের প্রথম মিছিল (মিয়া, ২০১০)। এ বিষয়ে আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী আনোয়ারা বেগম লিখেছেন:

> ... তখন খুলনায় একটিই মাত্র মেয়েদের কলেজ ছিল। খুলনা মহিলা কলেজের নাম ছিল আর কে গার্লস কলেজ। সর্বমোট আইএ, বিএ ক্লাসের ছাত্রী মিলে ছিল পয়ত্রিশ জনের মত। আমরা বিএ ক্লাসের ছাত্রী ছিলাম। মেয়েদের জন্য হাইস্কুল ছিল করোনেশন গার্লস হাইস্কুল আর রেলওয়ে বি আর সিং গার্লস স্কুল। আমরা মেয়েদের নিয়ে ক্লাস বর্জন করে মিছিল করি। বি আর সিং গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ আমাদেরকে সহায়তা করেন। বাধা দেন করোনেশন গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস তসলিমা আবেদ। তসলিমা আপার সাথে আমাদের কথা কাটাকাটি হয়। তিনি পুলিশের ভয়ও দেখান। আমরা মেয়েদের বের করে আনতে সমর্থ হই (বেগম, ১৯৯২,পৃ. ৪৪)।

ঐদিন দিনের বেলায় প্রকাশ্যে সরকারবিরোধী পোস্টারও লাগানো হয়। ঐদিন ছাত্রীদের মিছিল সম্পর্কে আর. কে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী মাজেদা আলীর স্মৃতিচারণ:

> দু'জন করে সারিবদ্ধভাবে পোষ্টার হাতে পি.টি. আই স্কুলের মোড় থেকে মহেন্দ্র হীল (বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড়) পর্যন্ত (পুরা আহসান আহমেদ রোড) মিছিলটি লম্বা হয়েছিল। রত্না ও কৃষ্ণা শ্লোগান বলার জন্য বড় বড় চোঙা যোগাড় করেছিল। শ্লোগানের ভাষা ছিল 'নুরুল আমিন গদি ছাড়ো', 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না', 'ফ্যাসিষ্ট শাহী গদি ছাড়ো', 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু কিছুতেই মেনে নেবো না' ইত্যাদি (আলী, ২০১৯)।

মিছিলটি আহসান আহমদ রোড, যশোর রোড, পিকসার প্যালেসের মোড় ঘুরে এসে তৎকালীন মহিলা পার্ক মহেন্দ্র হিলে আসে। মহেন্দ্র হিলে ছাত্রী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার মাধ্যমে মিছিল এবং সভা শেষ হয়। এ মিছিল শহরে বিশেষ সাড়া জাগায়। রাস্তার দুই পাশের মানুষ তাদের করতালি দিয়ে উৎসাহিত করে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে এম. এ. গফুরের সভাপতিত্বে মিউনিসিপ্যাল পার্কে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি এম. এ. গফুরকে আহ্বায়ক করে খুলনায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটির উদ্যোগে হরতাল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে আন্দোলন খুলনার মফস্বল এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালের ভাষা দিবসেও খুলনার মেয়েরা পৃথকভাবে মিছিল করে পার্কে একত্র হয়ে সভা করে। সভায় বক্তৃতা করেছিলেন রোকেয়া মাহবুব শিরি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> ১৯৫৩ সালে যখন আবার একুশে ফেব্রুয়ারি এসেছে তখন মেয়েরা খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আলতা দিয়ে ফেস্টুন লিখেছিল, ব্যাজ পরিধান করেছিল। অনেককে বাড়ী থেকে আসতে দিতে চায় নি। তারা ভোর রাতে উঠে চলে এসেছে। স্কুলের সামনে এসে মেয়েরা জড়ো হয়েছিল কিন্তু স্কুলের দরজা বন্ধ ছিল। ফলে হোস্টেল থেকে মই এনে স্কুলের দেয়াল পার করে মেয়েদের হোস্টেলে এনেছি। ফলে ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি মেয়েদের মিছিল খুব বড় হয়েছিল। অবশ্য মিছিল শুরু হলে অনেক অভিভাবক এসে মেয়েদের হাত ধরে মিছিল থেকে টেনে নিয়ে গেছে। এরপরও বহু মেয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিল করে লেডিস পার্ক গিয়ে আমরা ভাষা আন্দোলন

> সম্পর্কে সভা করি। মোটামুটি নেত্রী গোছের সবাই বক্তৃতা করে। আমিও বক্তৃতা দিয়েছিলাম (কবির, ২০১৮, পৃ. ১১৭)।

খুলনায় ভাষা আন্দোলনের সকল পর্যায়ে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ দেখতে পাই। সেই সময়ের সামাজিক রক্ষণশীলতা, পারিবারিক বাধা-নিষেধ সব কিছুকে অতিক্রম করে নারীরা ভাষার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

বাগেরহাট

ভাষা আন্দোলনের গোড়ার দিকে এই এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা ছিল খুবই কম। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদেশে ধর্মঘট আহ্বান করা হলে বাগেরহাটের স্কুল ও কলেজে (মুসলিম হাইস্কুল ব্যতীত) ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি বাগেরহাটের স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শোক মিছিল বের করেন। পিসি কলেজ সংলগ্ন তৎকালীন রামনারায়ণ পার্কে এসে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হন। দুপুরে সমাবেশ হয় এবং সেখানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি ছিল বক্তাদের মূল কথা (পিন্টু, ২০০০)।

সাতক্ষীরা

ভাষা আন্দোলনের সময় রাজধানীর সাথে সাতক্ষীরার সড়ক যোগাযোগ ছিল অনুন্নত। তাই ভাষা আন্দোলনের শুরুতে এই অঞ্চলের জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা খুবই কম ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও সাতক্ষীরার ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। সাতক্ষীরায় ভাষা আন্দোলনে নারীদের মধ্যে এগিয়ে এসেছিলেন স্কুল ছাত্রী গোলেরা বেগম ও সুলতানা চৌধুরী (বাসার ও ব্যানার্জী, ২০০০)।

যশোর

১৯৪৮ সালে যশোরে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। যশোর থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার প্রথম প্রতিবাদ জানান মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী, ছাত্র ফেডারেশন কর্মী হামিদা রহমান। তিনি যশোরে ভাষা আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় একজন সংগঠক ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৩ই মার্চ ভাষার দাবিতে যশোরবাসী চূড়ান্তভাবে সংগ্রামমুখর হয়ে ওঠেন। ঐদিন সকাল আটটার মধ্যেই কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের হয়। ঐ মিছিলে মেয়েদের নেতৃত্ব দেন হামিদা রহমান। তাকে সাহায্য করেছিলেন রুবী আহমেদ এবং সুফিয়া খাতুন। এর বাইরে ঐদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শহরের ঝালাইপট্টি পতিতালয়ের মেয়েরা। পুলিশ এক পর্যায়ে এই এলাকাটি ঘিরে ফেললে প্রায় চল্লিশজন ছাত্রকে পতিতারা তাদের ঘরে লুকিয়ে রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেয় (আলম, ২০০০)। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যশোর অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করলেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এখানে তেমন ব্যাপকতা পায়নি। ২৩ এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক দলগুলোর অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকায় গুলিবর্ষণের ঘটনার তদন্ত দাবি করা হয় এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি যশোর শহরে শহিদ দিবস পালিত হয়। ঐদিন সকাল দশটায় মধুসূদন কলেজ থেকে মিছিল বের হয় এবং মিছিল শেষে বেলা একটায় টাউন হল ময়দানে জনসভা হয় (আলম, ২০০০)। উক্ত শোভাযাত্রা এবং জনসভায় নারী শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিকর্মীদের উপস্থিতি ছিল।

নড়াইল

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নড়াইলের আলমডাঙ্গা আতিকুজ্জামান হাইস্কুলে হরতাল পালিত হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি রূপগঞ্জ কলেজ থেকে একটি মিছিল বের হয়ে নড়াইলের দিলরুবা স্কুলের সামনে এসে স্কুলের ছাত্রীদের মিছিলে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানায়। এই মিছিলে রিজিয়া বেগম, বেবি, রবি, রুবি, শেফালী, বুলবুল প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন (ভট্টাচার্য, ২০০০)।

কুষ্টিয়া

মফস্বল শহর কুষ্টিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও ভাষা আন্দোলনের তৎপরতা দেখা যায়। ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে স্কুলছাত্রী শাহিদা খাতুন ভাষা প্রশ্নে কুষ্টিয়াবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর কুষ্টিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্থানে ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ-সভা, বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। এই সকল আন্দোলনে ছাত্রীগণও অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন কুষ্টিয়া ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারা পূর্ণ হরতাল পালন করেন। শাহিদা খাতুনের সভপতিত্বে এক শোকসভায় ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিলে ছাত্রছাত্রীদের উপর সরকারের দমননীতির তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহিদ ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২৮শে ফেব্রুয়ারি এবং ৫ই মার্চের আন্দোলনেও ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন (নিশির, ২০০০)।

চুয়াডাঙ্গা

১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চুয়াডাঙ্গাকেও স্পর্শ করেছিল। ১৯৫২ সালের ২রা জানুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ৫০-৬০ জনের একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে একটি সভা হয় এবং উক্ত সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন উষা চ্যাটার্জী (আলাউদ্দিন, ২০০০)। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি টাউন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। আন্দোলনে স্থানীয় গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রীদের একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে (রফিক, ২০১৯)। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণের সংবাদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গাবাসী জানতে পারেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভি. জে. স্কুল, গার্লস স্কুলসহ চুয়াডাঙ্গার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশাল প্রতিবাদ-মিছিল বের করা হয়। ছাত্রীদের মধ্যে বেলা, পান্না, পাখি মিছিল পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে যোগদান করেন। মিছিল শেষে আলী হোসেনের আমবাগানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা দেন উষা চ্যাটার্জী, ইলা হক, বেলা, হেনা প্রমুখ। ২২শে মার্চ ভি. জে. স্কুলের ছাত্ররা একটি মিছিল নিয়ে গার্লস স্কুলে আসেন এবং ছাত্রীদের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। রেবার নেতৃত্বে ছাত্রীরা মিছিলে যোগদান করেন। রেবা ছাড়াও ছাত্রীদের নেতৃত্বে ছিলেন রুবী, হেনা, আনোয়ারা, বেলী, বুলবুলি, পাখী, বেলা, পান্না প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় বেলার লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল (আলাউদ্দিন, ২০০০)। চুয়াডাঙ্গার ভাষা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আর আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ভি. জে. স্কুল ও গার্লস স্কুল।

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল

বরিশালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৮ সালে হলেও আন্দোলনে নারীরা অংশগ্রহণ করেন মূলত ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে। বরিশালে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার, রাণী ভট্টাচার্য, হোসনে আরা বেগম (নিরু), মঞ্জুশ্রী সেন, আনজিরা বেগম, সবিতা সাহা, দিবা সরকার, হালিমা খাতুন, নূরজাহান, লুৎফা জাহান, মাহেনুর বেগম, মিসেস অবনিনাদ ঘোষ, বীণা ঠাকুর প্রমুখ। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বরিশালের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন জগদীশ সারস্বত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রাণী ভট্টাচার্য ঐ স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে এক বিরাট মিছিল বের করেন। এ বিষয়ে রাণী ভট্টাচার্য বলেন, ''আসলে মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা যে ভাষায় কথা বলতে পারছি সেই ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে, তা মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই নিজের বিবেকের তাড়নায় সেদিন আমি আর এক শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী মিছিলে গিয়েছিলাম। সকলের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও'' (সাদিয়া, ২০১৬, পৃ. ৭৮)। তাঁর স্মৃতিচারণ:

> ... ১৯৫২ সালে আমি তখন জগদীশ সারস্বত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি শিক্ষকদের বললাম ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে যোগ দিতে, কিন্তু কেউই সাহস পায়নি। আমি মেয়েদের নিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলাম। তখন সদর গার্লস স্কুল সরকারি হয়নি। সে স্কুলের কাছে মিছিল নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাদেরকে স্কুল হতে বের হতে দেয়নি। আমরা টাউন হল থেকে মিছিল করে কাঠপট্টি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বিরাট মিছিল। এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করেছি (কবির, ২০১৮, পৃ. ১২২)।

বরিশালের অন্যতম বৃহৎ এ মিছিলে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং নারীরা অংশ নেয়। প্রায় বিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ মিছিলটি সমগ্র বরিশাল অঞ্চলে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। মিছিলটি টাউন হল থেকে বের হয়ে বাজার রোড, বান্দ রোড, ক্লাব রোড, পুলিশ লাইন হয়ে বগুড়া রোড দিয়ে টাউন হলে এসে সমাপ্ত হয়। এ মিছিলে নারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেগম হামিদউদ্দিন এবং হোসনে আরা নিরু (আলী, ২০১১)।

২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতা হত্যার প্রতিবাদে বরিশাল শহরে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল হয়। অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে ভোর হতেই ছাত্র-জনতা জড়ো হতে থাকে। গ্রাম হতে আগত জনতা ছাড়াও শহরের শত শত নারী বেগম শামসুন্নাহারের নেতৃত্বে প্রথম শোভাযাত্রা করেন। মিছিলের প্রথম দিকে ছিলেন মেয়েরা, তারপর সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। বৃহত্তম এই মৌন মিছিলটি টাউন হল হতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে সার্কিট হাউজ ময়দানে শেষ হয় (ফিরোজা, ২০০০)। ২২শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন থেকেই সাধারণ নারীরা ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। চাঁদা তুলে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন ছাত্রীরা। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুল ও বাসায় গিয়ে নারীদেরকে সংগঠিত করে মিছিলে যোগদান করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করতেও তারা ভূমিকা রাখেন। এই ভাষা আন্দোলনের সময়েই প্রথম বারের মতো বরিশালের নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে মিছিলে, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ঝালকাঠি

ভাষা আন্দোলনের সময় ঝালকাঠিতে কোনো কলেজ না থাকায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি স্কুলগুলোতে হরতাল পালনের চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি। কিন্তু ঢাকার মিছিলে ছাত্রহত্যার খবর ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে ঝালকাঠিতে পৌঁছানোর সাথে সাথে উত্তেজিত ছাত্ররা বাইরে বেরিয়ে আসে। সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের নেতৃত্বে ঝালকাঠি সরকারি বালক বিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিল বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছালে ছাত্রদের কাছ থেকে ঢাকায় গুলিবর্ষণের খবর ছাত্রীরা পান এবং ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী লাইলী বেগমের নেতৃত্বে ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। বিক্ষোভ মিছিল উদ্‌বোধন বিদ্যালয়ের কাছে আসলে সেখান থেকেও ছাত্রছাত্রীরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে ঝালকাঠি বালিকা বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয় (সরকার, ২০০০)।

মূল্যায়ন

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ব-বাংলার জনগণ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান অতিক্রম করে। পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই বাংলার নারী-সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এ আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই *বেগম* পত্রিকায় বেশকিছু সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে নারীরা রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাদের অনেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে এই অঞ্চলের নারী-শিক্ষা ব্যাহত হবে বলে মনে করেন। পাশাপাশি অনেক নারী শিক্ষার মাধ্যম বাংলা না হলে তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করতে পারবেন না এরূপ আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। নারী-সমাজের এরূপ ভাবনা ভাষা আন্দোলনে সর্বস্তরের নারীর অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। নারীরা ভাষা আন্দোলনে মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদান, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্‌বুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে মিছিল-মিটিংয়ে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রেও মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের প্রচারণায়ও তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ভাষা আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালনা করতে অর্থ-সংগ্রহের জন্য নারীরা বিভিন্ন স্থানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। এর বাইরে তারা পোস্টার এবং লিফলেট লেখা ও লাগানো এই কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। শুধু ঢাকা শহরে নয়, বিভিন্ন বিভাগীয় শহরেও আন্দোলন-সংগ্রামে নারীরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই অনগ্রসর সমাজে, কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে মফস্বল শহর বা মহকুমাতে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীসহ সাধারণ নারীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কোনো কোনো স্থানে শিক্ষিকাদের অনেকেই ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের অগ্নিকন্যা ছিলেন মর্গ্যান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম। কেউ কেউ ছাত্রীদের মিছিল ও সভাতে অংশ নিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কোনো কোনো অঞ্চলে নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগ্রাম কমিটিতেও যুক্ত ছিলেন কেউ কেউ। শুধু ১৯৫২ সালের আন্দোলনেই নয় পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৩-১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায় পর্যন্ত প্রতি বছর নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে তাদেরকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার। সামাজিক, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, ধর্মীয় বিভিন্ন দিক থেকেই প্রতিনিয়ত নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তারা।

তখনকার রক্ষণশীল সমাজে মেয়েদের আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণকে মোটেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হতো না। তখন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পর্দাঘেরা ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশায় নারীরা চলাফেরা করতেন। নারীদের ঘরের মধ্যে এক প্রকার অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হতো। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় অন্য শহরগুলোতে অবস্থা ছিল আরও খারাপ। সিলেটের মতো রক্ষণশীল সমাজে ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আবুল মুহিত বলেন, 'এক হিসেবে নারীরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। তাদের ভূমিকা অসাধারণ, সেই ১৯৪৮ সালে যখন নারীরা রাতে রাস্তায় হাঁটত, দিনে কেউ হেঁটে বের হত না, দিনে রিক্সায় চড়লে শাড়ি দিয়ে রিক্সা ঢেকে যেত। সেই অবস্থায় আন্দোলন করা সিলেটের মত জায়গায়, তা ছিল অসাধারণ ভূমিকা' (কবির, ২০১৮,পৃ. ১৩১)। সামাজিক রক্ষণশীলতার সাথে যুক্ত হয়েছিল পারিবারিক প্রতিবন্ধকতাও। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ভাষাসংগ্রামী তালেয়া রহমান বলেন, ''মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল পরিবার। পরিবার থেকে বাইরে যেতে বাধা দিত। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েছি'' (কবির, ২০১৮, পৃ. ১৩৭)।

অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও যে ছিল না তা নয়। অনেকেই পরিবার থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের উৎসাহ পেয়েছেন, সহযোগিতা পেয়েছেন। সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের বেশিরভাগকেই স্বদেশ কোনো মূল্য না দিলেও, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনেক মূল্য তাদের অনেককেই দিতে হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন মমতাজ বেগম। শুধু তাই নয়, এ ঘটনার সূত্র ধরেই তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। অনেকের লেখাপাড়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়। চুয়াডাঙ্গায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কুল-ছাত্রী বেলার লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই অপরাধে খুলনার ভাষাসংগ্রামী মাজেদা আলীকে হোস্টেল থেকে বের হয়ে যেতে হয়। স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের অপরাধে তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন সিলেটের ভাষাকন্যা ছালেহা খাতুন। তবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা এ সকল প্রতিবন্ধকতা সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তারা মাতৃভাষার লড়াইয়ে যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা এই ত্যাগ, সাহসের উপযুক্ত মূল্য, যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছে কি? প্রশ্নের উত্তর খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। ঢাকায় এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোতে ভাষা আন্দোলনের সাথে যে-সকল নারী জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি (একুশে পদক) এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (তমদ্দুন মজলিস, উদীচী, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সংগঠন, পদাতিক নাট্য গোষ্ঠী, বরিশাল পৌরসভা, Steps Towards Development, Democracy watch, Rotary club) স্বীকৃতি। এসব প্রতিষ্ঠান ভাষা-সংগ্রামীদের সম্মাননাপত্র, সনদ এবং ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানে ভূষিত করেছে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত পরিবারের নারীরা স্বীকৃতিপ্রাপ্তির দিক থেকে এগিয়ে আছেন। কিন্তু অবহেলিত থেকে গেছেন বিভিন্ন মহকুমা (বর্তমানে জেলা) ও মফস্বলের নারীরা। এদের অনেকের নামও আমরা জানি না। অনেক ভাষাকন্যা এখনো অন্তরালেই রয়ে গেছেন, হারিয়ে গিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ের বা মফস্বলের এই ভাষাসংগ্রামীদের অন্তরাল থেকে বের না করে ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

আবদুল্লাহ, তুষার (১৯৯৭)। *বাহান্নর ভাষাকন্যা*। ঢাকা: নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।

আনিসুজ্জামান (২০১৫)। *কাল নিরবধি*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

আলম, আকসাদুল (২০০০)। 'যশোর'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আলাউদ্দিন, এম. এম. (২০০০)। 'চুয়াডাঙ্গা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আলাউদ্দিন, এম. এম (২০০০)। 'চুয়াডাঙ্গা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আলী, বেগম মাজেদা (২০১৯)। *শিউলী ঝরা দিনগুলো*। খুলনা: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

আলী, জি এম বাবর (২০১১)। 'ভাষা আন্দোলেনে বরিশালবাসীর ছিল উজ্জ্বল ও গৌরবময় ভূমিকা'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

আলীম, এম আবদুল (২০১৮)। *সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আহমদ, খালেদ (২০১১)। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রথম জনসভা হয়েছিল সিলেটে'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

আহমদ, জমির (২০০০)। 'ফেনী'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসমাঈল, তরফদার মুহাম্মদ (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জ*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

ইসলাম, তসিকুল (১৯৯৯)। *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, তসিকুল (২০০০)। 'রাজশাহী'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, নূরুল (১৯৯৬)। 'রংপুরে ভাষা আন্দোলনের কিছু স্মৃতি কথা'। *দৈনিক যুগের আলো*। একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা। রংপুর।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল (১৯৮৪)। *মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ৩য় খণ্ড। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৮)। *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

কামাল, মোস্তফা (১৯৮৭)। *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*। ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।

খান, রফিকুল আলম (২০১১)। 'সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের সময় মাইক না থাকায় টিনের চোঙ্গা ব্যবহার করা হয়েছিল'।

খান, সুমি (২০০১)। 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম'। *সাপ্তাহিক ২০০০*। ২৩ ফেব্রুয়ারি।

খোকন, আবুল হোসেন (২০০০)। 'বগুড়া'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চাদু, আবদুল কুদ্দুস (২০০০)। 'পাবনা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী (২০০০)। 'চট্টগ্রাম'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জামান, শফিক (২০০০)। 'জামালপুর'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী (২০০০)। 'সিরাজগঞ্জ'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

তোতা, শাহাবুল শাহীন (২০০০)। 'গাইবান্ধা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

নিখিল, ভুবন রায় (২০১১)। 'ভাষা আন্দোলনে নীলফামারী: জনতার সংগ্রাম'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

নিশির, শাহ আরিফ (২০০০)। 'কুষ্টিয়া'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

পারভিন, শাহনাজ (২০০৭)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

পিন্টু, শরিফুজ্জামান (২০০০)। 'বাগেরহাট'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ফিরোজা, বেগম (২০০০)। 'বরিশাল'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বানু, আখতার (১৯৯৯)। 'রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা'। তসিকুল ইসলাম [সম্পা.]। *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বানু, আখতার (২০০৪)। 'স্মৃতিচারণ: রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা'। তসিকুল ইসলাম [সম্পা.]। *রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন।

বাসার, পল্টু ও ব্যানার্জী, কল্যাণ (২০০০)। 'সাতক্ষীরা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (২০০০)। 'খুলনা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বিশ্বাস, কুণ্ডল (২০০০)। 'নেত্রকোনা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বেগম, আনোয়ারা (১৯৯২)। 'ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ভোলার নয়'। খোন্দকার আবুল হাশেম (সম্পা.)। *অমর একুশে*। খুলনা: সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

বেগম, মালেকা (১৯৮৯)। *বাংলার নারী আন্দোলন*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ (২০০০)। 'নড়াইল'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ভৌমিক, রীতা (২০১২)। *২৪ জন ভাষাসংগ্রামীর জীবন কথা*। ঢাকা: ধ্রুবপদ।

ভৌমিক, সুশান্ত (২০১১)। 'ভাষা আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না রংপুর'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

মতিন, আব্দুল ও রফিক, আহমদ (১৯৯১)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

মাহবুব, এম. আর (২০১১)। 'ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম: জীবন ও কর্ম'। এম. আর. মাহবুব [সম্পা.]। *ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ।

মাহবুব, এম. আর (২০১৫)। *নরসিংদীতে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ।

মিয়া, শেখ গাউস (২০১০)। *ভাষা আন্দোলন খুলনা ও বাগেরহাট জেলা*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

মোহাম্মদ, তাজুল (১৯৯৪)। *ভাষা আন্দোলনে সিলেট*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

মোহাম্মদ, তাজুল (২০১৭)। *ভাষা সংগ্রামীদের কথা; বৃহত্তর সিলেট*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

রফিক, আহমদ (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

রায়, প্রদীপ কুমার (২০০০)। 'মানিকগঞ্জ'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সরকার, শ্যামল চন্দ্র (২০০০)। 'ঝালকাঠি'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সাজ্জাদ, সাজ্জাদুর রহমান (২০১১)। 'জনবিরল পঞ্চগড়েও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

সাকী, গোলাম সাকলায়েন (২০০০)। 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সাদিয়া, সুপা (২০১৬)। *বায়ান্নর ৫২ নারী*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

সিদ্দিকী, মামুন (২০১৫)। *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

স্মৃতিফলক (২০০৫)। 'ভাষা আন্দোলনে রাজশাহীতে স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা'। ভুবন মোহন পার্ক, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ফলক উন্মোচন: ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

হক, গাজীউল (১৯৯৯)। 'স্মৃতিচারণ'। তসিকুল ইসলাম [সম্পা.]। *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হক, গাজীউল (২০০০)। *আমার দেখা আমার লেখা*। ঢাকা: মেরী প্রকাশন।

হক, মুহম্মদ একরামুল (১৯৯৫)। *রাজশাহী জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হান্নান, মোহাম্মদ (১৯৮৬)। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

হাসান, এ. কে. এম. রিয়াজুল (২০০০)। 'শেরপুর'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হেলাল, বশীর আল্ (১৯৮৪)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হোসেন, মহব্বত (২০১১)। 'টাঙ্গাইলের ভাষা সৈনিকদের অনুপ্রেরণায় ছিলেন মওলানা ভাসানী'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly (1952) 22nd February, Vol. vii.

দৈনিক পত্রিকা

দৈনিক আজাদ, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ১লা মার্চ ১৯৫২।

ভোরের কাগজ, ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

সাক্ষাৎকার

আহমেদ, সুফিয়া (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। গবেষক কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

খাতুন, শরীফা (১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)। গবেষক কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।